পিন্ডারি হিমবাহের পথে

রঞ্জিত কুমার হালদার

কুমায়ুন হিমালয়ের জনপ্রিয় ট্রেক টে পিন্ডারি হিমবাহ। পুজোয় যাঁরা একটু অন্যরকম ভাবে ছুটিকাটাতে চান তাঁদের জন্য পিন্ডারি ঘুরে এসে কলম ধরেছেন রঞ্জিত কুমার হালদার

ছেলেবেলার ভূগোল পাঠ্যবইয়ের হিমবাহ পিন্ডারি হিমবাহ নেতৃত্বে আমরা চারজন, মানে আমি, ইন্দ্রজিৎ,গোতমদাও বুদ্ধ হাওড়া স্টেশন থেকে চেপে বসলাম ৩১১৯ আপ বাগ এক্সপ্রেসে। গন্তব্য ১৫৬০ কিমি দূরের কুমায়ুনের প্রবেশেদ্বার হলদে ায়ানী। দীর্ঘ ট্রেন সফরের পর ট্রেন লেট থাকায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল বাধ্য হয়েই রাতটা স্টেশন সংলগ্ন হোটেল কাট াতে হল। সময় থাকার জন্য ট্রেকিং পথের প্রয়োজনীয় রেশন এখানকার বাজার থেকেই সংগ্রহ করলাম। পরের দিনের য াত্রা খুব ভোরে শু করার জন্য আজই জিপ বুকিং সেরে রাখলাম। এই হলদোয়ানী থেকে নৈনিতাল, রানিখেত, অলমোড়া, কৌশানি, বাগেশ্বর, গোয়ালদাম, পিথোরাগড়, ভারারি প্রভৃতির বাস ও জিপ পাওয়া যায়।

আজকের গন্তব্য, ১৭৭ কিমি. দূরত্বের বাগেশ্বর পর্যন্ত। জিপ যাত্রা শু করেই প্রথমে এলাম কুমায়ুনের আর এক জনপ্রিয় শহর কাঠগোদামে। আমরা ট্রেনে সরাসরি এখানেও নামতে পারতাম। কিন্তু যানবাহনের সহজলভ্যরতার জন্য হলদোয় ানীকেই বেছে নিয়েছিলাম। এখান থেকে প্রায় ৩০ কিমি যাওয়ার পর জিপ থামে ভাওয়ালীতে।উচচতা ৫৬০০ ফুট। ঝক্‌ঝকে্, তকতকে একটি সকাল। মিহিকুয়াশার নরম বেশমী পর্দাটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো করে দিচ্ছিল সকালের ঝলমলে রোদ। ছোট্ট সুন্দর পাহাড়ি শহর ভাওয়াওলী। রাস্তায় দুদিকে ফলের বাজার দোকান।এখানে সকালের ব্রেকফ াস্ট সেরে জিপে উঠে বসলাম শহরাঞ্চলের ছিটে ফোঁটাও প্রায় নিঃশেষ রাস্তায় দুধারেই এসে গেছে গাছ গাছলির জটল া। জঙ্গল কোথও বা ঘন কোথাও বা পাতলা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে আদিবাসী পাহাড়িদের গ্রাম, ক্ষেত, খামার। ধানের শিষে শিষে হলুদ রঙয়ের তুলি বোলানো, মাঝে মধ্যে রামচানার ক্ষেত। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে উচছল এক নদী। ড্রাইভার জানাল, এর নাম কোশী, পুরাণে যার উল্লেখ আছে কৌশিনী বলে। পৌঁছালাম গরমপানী। ভাওয়ালী থেকে দূরত্ব ২০ কিমি। এখান থেকে আরও উত্তরে সোমেশ্বরের ভটকোট পাহাড়ে জন্ম নিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় টপকে কোশী নদী লীন হয়েছে রামগঙ্গায়। এগিয়ে চললাম পাইনের ছায়া ঘেরা কালো পিচরাস্তা ধরে। ধীরে ধীরে ক্রমশ উপরে উঠছে আমাদের বাহন। গরমপানি থেকে ২৫ কিমি চলার পর এসে পৌঁছলাম৫৪৯৫ ফুট উঁচুতে আলমোড়ায়। কুমায়ুনের প্রাচীন ও জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট এই আলমোড়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুদিন এখানে কাটিয়েছেন। এই শৈলশহর থেকে ত্রিশূল, নন্দ াদেবী, নন্দাঘুন্টি, কেদারনাথ প্রভৃতি শৃঙ্গরাজি দেখা যায়।

মধ্যহভোজ সেরে যাত্রা শু করলাম পরবর্তী গন্তব্য ৫২ কিমি. দূরের মহাত্মা গান্ধীর অনাসক্তি আশ্রম খ্যাত কৌশানির উদ্দেশ্যে। এখানকার গান্ধী আশ্রম থেকে সূর্যোদয় ও সূযাস্ত দেখতে বহু পর্যটক আসেন। আলমোড়া শহর পথের বাঁকে অ াস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল তার আভিজাত্য, গর্ব ও বনেদিয়ানা। ক্রম ৪০ কিমির পরের এল সোমেশ্বর (৪৭০০ ফুট)। পথের ধারেই সোমেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির। কিছু ঘরবাড়ি, দোকান পাটছড়ানো ছিটানো। গাড়ি এগিয়ে চলল আঁকাবাঁকা পথ ধরে। সোমেশ্বর থেকে ১২ কিমি অতিক্রম করে এলাম কৌশানিতে। চা পর্ব সেরে ১৩ কিমি দূরের গড় পেরিয়ে আরও তিন কিমি এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম গোমতীর তীরে বৈজনাথে। বিশলে গোমতীর জলে স্নান পর্ব সেরে শিবের মন্দিরে পূজা দিয়ে রওনা দিলাম ২৪ কিমি দূরে আজকের শেষগন্তব্য সরযু নদীর তীরে বাগেশ্বরে (৩০০০ ফুট)।

এখানে এসে সকলেই খুব ক্লান্ত। আজ পাঁচজনে সিদ্ধার্থ হোটেলের একটা ঘর নিয়ে বাগ্গেরেই কাটালাম। গোমতী ও সরযুর গাঢ় আলিঙ্গনস্থল এই বাগ্গের পার্বত্য শহর হিসাবে বেশ উন্নত ও অভিজাত্যপূর্ণ। শহরের ঠিক মাঝে একটা টিল ার মাঝে নীল্লের শিবের মন্দির। প্রায় ৪৫০ সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হবে।

ঘুম থেকে উঠে সকলে ব্রেকফাস্ট করে তৈরি হয়ে নিলাম। আজকের গন্তব্য জিপে ভারারি হয়ে স্যাং সেখান থেকে তিন কিমি ট্রেক করে লোহার ক্ষেত। ৬০০ টাকার একটি জিপ ভাড়া করে এগিয়ে চললাম। সরযূকে ডাইনে রেখে জিপ এগিয়ে চলল। বাগ্গেরের পর থেকে রাস্তা বেশ খারাপ, ভাঙ্গাচোরা। পাহাড়ের গায়ে সবুজ শস্যক্ষেতও বিভিন্ন পাহাড়ি গ্রাম পেরিয়ে ২০ কিমি পরে এল কাটকোট। এখান থেকে তিন কিমি দূরে ভারারি (৩৫০০ ফুট)। আগে বাস বা জিপ এই ভারা রি পর্যন্তই যেত। কিন্তু এখনও আরও ১২ কিমি এগিয়ে জিপ/ বাস যাতায়াত করে সাংবা সোয়াং পর্যন্ত (৪৪২৫ ফুট)। ভ াবারির ভিজে ভিজে জলো হাওয়া লাগছিল চোখে মুখে। তাড়াতাড়ি উইন্ডচিটারটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। নাচতে নাচতে জিপ এগিয়ে চলল। বাঁদিকে ছোট ছোট খুশির ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে সরযু। জিপে এসে একটা অপরিচ্ছন্ন স্যাঁত স্যাঁ াত জায়গায় দাঁড়াল - সাং। জিপ দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গোটা পাঁচেক ছেলেরদল গাড়িটা ঘিরে ধরল। আসলে রেশনের বস্তা ও টেন্টটা বাইবার জন্যই আমাদের একজন পোর্টার-এর প্রয়োজন ছিল। অজয়দা টটা ভাল মতোনই চিনতেন, তাই গাইড প্রয়োজন ছিল না। দৈনিক ১২৫ টাকা মজুরি হিসাবে খরক সিং নামে একটি তরতাজা যুবককে বাছলাম। খরক বলল ফিকার মত কিজিয়ে, হাম হ্যায়, নো প্রব্লেম।

ছোট্ট চা বিরতির পর পিঠে কস্যাক নিয়ে এগোতে লাগলাম তিন কিমি দূরের লোহার ক্ষেতের দিকে। স উর্ধমুখী চড়াই পথ, গ্রামের মধ্যদিয়ে ক্ষেতের পাশ দিয়ে রাস্তা। মাথায় নীল আকাশের চাঁদোয়া, এই দ্বিপ্রহরেই ঝনঝিঁঝির শব্দ। প্রথমদিন তাই ধীর গতিতে যে যার আপন ছন্দে এগিয়ে চলেছি। এসে পৌঁছালাম লোয়ার লোহার ক্ষেতের পূর্ত বিভাগের ইনশপেকশন বাংলোর কাছে। এখানে না থেকে আমরা থাকব ১৩০ কিমি উপরে আপার লোহার ক্ষেতে কে.এম.ভি. এমের বাংলোয়। উচচতা ৫৮০০ ফুট। ইতিমধ্যে ঝিরঝির বৃষ্টি শু হয়ে গেছে। বৃষ্টি মাথায়নিয়ে বাংলোয় ঢুকলাম তখন ঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে। পোষাক পাল্টে কফির পাত্র হাতে বসলাম বাংলোর বারান্দায়। বড় সুন্দর পরিবেশে বাংলো টি। অর্ধবৃত্তাকার একটি সবুজ মাঠের মাঝে ছিমছাম ছোট্ট আস্তানাটি যেন রূপকথার টিলা।

সামনে বৃষ্টি আর দূরে গ্রামের ঘর বাড়ি ও ধানচাষের ক্ষেতের ওপর পড়ন্ত সোনালি রোদ্দুর। আর সোনালি রোদ্দুর এসে যেন ধুয়ে দিচ্ছে সবুজ ময়দানটাকে। আর দিগন্তজোড়া পাহাড়ের বুকে এক বিশাল রামধনু। অপূর্ব সে চিত্র। অল্পদূরে পাহাড়ি এক ঝোরা। সন্ধ্যার ঘোর লাগতেই আকাশে শু হল অন্তরাগের খেলা। কনে দেখা আলোয় এই পাহাড়ি বনস্থল মুহূর্তে পাল্টে বারে বারে ধরছিল নবীন বেশ। রাতে বাংলোর কেয়ারটেকার কুমায়নীর আতিয়েতার সঙ্গে খিচুড়ী ও ডিমভাজা আচার সহযোগে পরিবেশন করলেন -- যা অমৃতসমান মনে হল। রাত বাড়ার সঙ্গেঠাণ্ডাও জাঁকিয়ে পড়েছে। ত াই তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকতেই হল।

পরদিন সকালে পোর্টার খরকের তৈরি আলুপরোটা খেয়ে বেরিয়ে পড়া ঢাকুরী টপ (১০০০০ ফুট) পেরিয়ে খাতিগ্রাম (৭৫৬০ ফুট)। আজ হাঁটতে হবে প্রায় ১৭ কিমি পথ। লোহার ক্ষেতের বাংলো ছাড়িয়ে কিছুটা এগোনোর পরেই পথটা ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। গাছের পাতার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে গায়ে এসে পড়ছে সোনালি রোদ্দুর। রাস্তার দুটি শিশুর আবদার নামস্তে বাবু, মিঠাই দো। সঙ্গে সঙ্গে দুটি লজেন্স পেয়ে ফোলা গালে টোল ফেলে ছড়িয়ে দেয় নিষ্পাপ হাসি। এ এক পরমপ্রাপ্তি। শু হল ঘন জঙ্গল আর দমবন্ধকরা চড়াই। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে পিঠের জামা ঘামে ভিজে সপসপ করছে। পাথর বিছানো রাস্তা , মাঝে মধ্যেই জলকাদায় ভর্তি, স্যাঁতসাঁতে ভাব। কানে আসছে বোঝার জলস্রোতের শব্দ। পথে পড়ল দুটো ঝরণা। দেবদা আর পাইনের শাখায় শাখায় ঝুলে আছে নানাজাতের রঙ - বেরঙের অর্কিড। পাথরের খাঁজে খাঁজে ফুটে রয়েছে মন, ফার্ণ ও প্রিমূলা জাতীয় ফুল।

ঘন্টা চারেকের টানা চড়াইয়ের শেষে একটা চায়ের দোকান নজরে এল খরক জানালো। সরযু উপত্যকা প্রায় শেষ, আমরা ঢুকুরী পাসের কাছাকাছি চলে এসেছি। খানিক চা পান -এর বিরতির পর আবার আপন ছন্দে চলা শু। এখানে থেকে ঢুকুরী পাশের দূরত্ব আধ কিমির মতো। কিন্তু পুরোটাই দমফাটা নির্দয় চড়াই। ইতিমধ্যেই আমরা পিন্ডারি উপত্যকায় প্রবেশ করেছি। পৌঁছে গেলাম ছাকুরী টপে (১০০০০ ফুট)। পাহাড় চূড়ায় নন্দাদেবী মন্দির। ভেতরে একটা ত্রিশূল। বাইরে একটা লাঠির সঙ্গে বাঁধা বেশ কয়েকটি পিতলের ঘন্টা ও ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণের বিভিন্ন চিহ্ন। ঘন্টার টুংটাং শব্দে মুখরিত হয় পাহাড়, জঙ্গল, আকাশ বাতাস। পূজা দেওয়া হল মন্দিরে, সঙ্গে নিয়ে আসা নারকেল, ধূপ ও বাতাসা সহযোগে। মন্দিরের পাশে বসতেই নজরে পড়ল মাইকতোলি শৃংগ (মাইকীতোলি বা মায়ের স্থান)। এবার নামার পালা, প্রায় ৮০০ ফুট নীচে, পাইনের মাঝে সবুজ ঢালু বিশাল উপত্যকা! ঢাকুরীভ্যালি। যেন এক সুদৃশ্যে গলফ কোর্স। এরই মাঝে কে.এম. ভি. এমের বাংলো। আজ দুপুরের আহার এখানেই। ঢাকুরী ময়দানের প্রান্তে চোখে পড়ল একটা স্মৃতি স্তম্ভ। ১৯৯২ এ মাইকতোলি অভিযানে গিয়ে তুষারে শেষ শয্যা পেতেছিলেন জগদীপ বিস্তসহ ৮জন পর্বতারোহী। এই পাহাড়ি নায়কদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাত্রা শু করলাম ৮কিমি দূরের ৭২৫০ ফুট উঁচুতে খাতিগ্রামের দিকে। পুরো রাস্তাটাই উৎরাই। সুন্দর মেঘমুক্ত নীলআকাশ। চার কিমি আসার পর পৌঁছাই ওমলা গ্রামে। এখান থেকে একটা পথ গিয়েছে ওয়াদাম হয়ে পিন্ডার নদীকে অতিক্রম করে সুন্দর ডুঙ্গার দিকে। পাথর বিছানো স বনপথ ধরে শুধুই নেমে চলা। পথের আশেপাশে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দু-চার খানা কুঁড়ে। মেয়েরা ঘাঘরা পরা -- মাথায় আঁচল টানা, ক্ষেতে খামারে কর্মরত এদিক - ওদিক গমের ক্ষেত। শশার মাচায় শশা ঝুলছে। কিছুটা যাবার পর একটা স খাল পেরোতেই বাঁকের মুখে চোখে পড়ল একটা গ্রাম -- খাতি। খরক বলল, ইস ইলাকা কা ফলতা ফুলতা গাঁও হ্যায়। লছমী ইন গাঁওমে রহতে হ্যায়। খাতিকে একটা মডেল গ্রাম বলা চলে আমরা থাকলাম কে.এম.ভি.এমের ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসে। মোট ১৭ কিমি হাঁটলাম। এদিকে পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলোয় ঝলমল করে উঠছে রূপালি মুকুটপরা তুষারধবল শৃঙ্গরাজি। আস্তে আস্তে শু হল আকাশ জুড়ে রং-এর খেলা। আলৌকিক এক বনজ্যোৎস্না রূপালি ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল নিথর চরাচরে। এইদৃশ্য আমার দেহমনের সব জাগতিক অস্তিত্বকে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে দিয়েছিল। বাকদ্ধ হয়ে কতক্ষণ এই দৃশ্যদেখেছিলাম সত্যিই মনে নেই।

রাতে বৃষ্টি হওয়ার দণ বেশ ঠাণ্ডা ছিল। তাই ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হল। আজ গন্তব্য দোয়েলী হয়ে ফুরকিয়া, মোট ১৬ কিমি পথ। আজকের পথের প্রথমটা উৎরাই। কাঠের নড়বড়ে সেতুতে পিন্ডার নদী অতিক্রম করার পর পুরো চড়াই। পাইন ও ফারের জঙ্গল রেরিয়ে পচা পাতায় মাঝে মাঝে জল জমে স্যাঁতস্যাতে পরিবেশ। দাণ জোঁকের উপদ্রব। গাছের উপর থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে।

কিছুটা যাওয়ার পর আকাশ হঠাৎই মেঘে ঢেকে গেল। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি শু হল। ভিজে পিচ্ছিল পথের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। বৃষ্টি বয়ে চলেছে আপনমনে অঝোর ধারায়। রাস্তার বাঁয়ে পিন্ডার নদী গম্ভীর গর্জনে বয়ে চলেছে। বৃষ্টির সঙ্গে দামাল বাতাস । এদিকে রাস্তাও ভেঙ্গে যাচ্ছে, যেকোনও মুহূর্তে পা পিছলোলে পিন্ডারি নদীতে সমাধি হতে পারে আমাদের। অবশেষে এলাম মালিয়াধার। আকাশ এখন কিছুটা ভাল। চড়ুই ভেঙ্গে পৌঁছালাম দোয়েলী (৯১১২ ফুট)। দোয়েল কথাটির অর্থ সঙ্গমস্থল। পিন্ডার ও কাফনী নদীর মিলনস্থল এই দোয়েলী। এখান থেকে ১২ কিমি গেলে কাফনী হিমবাহে যাওয়া যায়। এখানেই দুপুরের আহার সেরে এগোলাম ফুরকিয়ার উদ্দেশ্যে। দূরত্ব ৫ কিমি। পুরোটাই চড়াই। গহীন অরণ্যের মধ্য দিয়ে পিন্ডার নদীকে বাঁয়ে রেখে পথচলা। রাস্তা বেশ খারাপ। কোনও জায়গায় খাতে নেমে আবার ওপরে উঠতে হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে চড়াই ভেঙে পৌঁছালাম ফুরকিয়ার পি.ডব্লুডির বাংলোতে (১০,৫০ ফুট)। বাংলোর অবস্থা বেশ কন। এদিকে ঠান্ডায় হাত - পা একেবারে জমে যাওয়ার উপক্রম। সঙ্গে মাথার টিপটিপ যন্ত্রণা। হোমিওপ্যাথি কোকা ৩০-র দৌলতে এযাত্রায় কোনরকম বাঁচলাম।

ঘুম ভাঙলো তীব্র ঠান্ডার মধ্যে বেশ সাতসকালেই। বাইরে নীল আকাশের নিচে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নন্দাঘাতশৃঙ্গ। বেরিয়ে পড়লাম ৭ কিমি দূরের বহু আকাঙ্ক্ষিত পিন্ডারি জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। মাথার উপর ঝলমলে আকাশ নিয়ে আমরা বিপুল উদ্যমে এগিয়ে চললাম। জুনিপার ছাড়া আর কোনও গাছ তেমনভাবে চোখে পড়ল না। পিন্ডারি নদী অনেক নীচে চলে গেছে। যতই এগোতে থাকি উপত্যকার পরিসর বেড়ে গিয়ে ক্রমশ চওড়া হতে থাকে।শু হল বৃষ্টি। সঙ্গে চিনির দানার মতো তুষারকনা তীরের মতো গায়ে বিঁধতে শু করল। দূরে দেখা গেল একটি ময়দানের মতো জায়গায় কয়েকটি ঘর ও ত ার উপর উড়ছে লাল রঙের একটি পতাকা। খরক বলল, ওহী হ্যায় পাইলটজী আশ্রম। আশ্রমের সন্ন্যাসী আমাদের গরম চা খাওয়ালেন। পয়সা কিছুতেই নিলেন না। তাঁকে বিদায় জানিয়েআমরা চললাম আরও ২ কিমি দূরে পিন্ডারির দিকে। তুষারপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বোল্ডারের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম।

কোনক্রমে এসে পড়লাম জিরো পয়েন্টের কাছে (১২৭০০ ফুট)। এত ঠান্ডা যে দমদম হয়ে যাচ্ছে। এত কুয়াশা কোনও কিছুই ঠিকমতো ঠাওর করা যাচ্ছে না। অজয়দা, খরককে নিয়ে তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত। কোনও রকমে তাঁবুতে ঢুকে স্লিপিং ব্য াগের ভিতর ঢুকলাম। অনেক ডাকাতিকেও ওঠার সাহস করলাম না। মনটা ভাল ছিল না -- হিমালয় কী আমাদের নির াশ করল? কিছুইতো দেখতে পেলাম না। ভয় লাগছিল তুষার ঝড়ে তাঁবু না উড়ে যায়। প্রচন্ডঠান্ডায় ঠিকমতো ঘুম হলো না। এদিকে মাথার উপরে রাখা চশমার বাক্সটা বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। অনেক কষ্টে খুঁজে পেলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারিদিকে বরফেব স্তূপ। হঠাৎই শু হল আকাশে আলোর ম্যাজিক। চারিদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পাঞ্চালি, বালডৌরী, প ানওয়ালি দোয়ার, নন্দাঘাত, নন্দাকোট, পিন্ডারি গ্লেসিয়ার প্রভৃতি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের উপর চলল বরফের মুকুটের প্রদর্শনী। হিমবন্তের এই উদার অঙ্গনই যেন বিশাল এক মন্দির প্রাঙ্গন। এগিয়ে গেলাম পিন্ডারি স্নাউটের দিকে। জশ তুষারের স্তূপ দুগ্ধধারার মতো এসে মিলছে পিন্ডার নদীতে। অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম। এবার ফেরার পালা।

জেনে রাখুন

পিন্ডারি হিমবাহ কুমায়ুন হিমালয়ের জনপ্রিয় ট্রেক রূট। এপ্রিল - মে ও সেপ্টেম্বর - অক্টোবর ট্রেক করার আদর্শ সময়। সঙ্গে তাঁবু থাকলে ভাল হয়। পিন্ডারি যাত্রাকে কেউ কেউ লেডিস্ ট্রেক বলে। আমি এর সত্যতা খুঁজে পাইনি। যথেষ্টই কষ্টসাধ্য ট্রেক ও রোমাঞ্চে ভরা। সর্বমোট আসা যাওয়া মিলে ৯৬ কিমি ট্রেক করতে হয়।

সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ, শীতবস্ত্র ও ঔষুধপত্র অবশ্যই নেবেন। পিন্ডারি জিরো পয়েন্টে থাকার জন্য তাঁবু নেওয়া জরি, অন্যথায় তাঁবুর খুব একটা দরকার পড়ে না। সদলবলে বেড়িয়ে পড়লে কোনও অসুবিধা নেই।

সুতরাং কস্যাক গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

খরচ - পাঁচজনের দল হলে মাথাপিছু ২৫০০ টাকা।